বিজন ভট্টাচার্য ও বাংলা নাটক

বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

বিজন ভট্টাচার্য
ও
বাংলা নাটক

যৌথ প্রকাশনা

প্রকাশনা
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া

পরিবেশক
দিয়া পাবলিকেশন
৪৪/১এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

সম্পাদকীয়

২০১৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বিজন ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ পালন উপলক্ষ্যে আমাদের রাজ্যে বিজনচর্চার যে উদ্যম ও আগ্রহ সূচিত হয় তারই সূত্র ধরে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের বাংলা বিভাগ 'বিজন ভট্টাচার্য ও বাংলা নাটক' বিষয়ে একদিনের জাতীয় আলোচনাচক্রের আয়োজন করে। দিনটি ছিল ২০১৬-র ২০ সেপ্টেম্বর। এই আলোচনাচক্রে অংশ নিয়েছিলেন নানা প্রান্তের গবেষক, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেক নাট্যস্বজন। সেই পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিজন ভট্টাচার্যের নাটকগুলিকে নতুনভাবে বিচার-বিশ্লেষণের তাগিদ আর আলোচনা-লব্ধ বিষয়গুলিকে একত্রে সংকলিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা।

বিজন ভট্টাচার্যকে নিয়ে ইতিপূর্বে যে কোনো সংকলন প্রকাশিত হয়নি এমন নয়। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থটি নানা কারণে নিজস্বতা দাবি করতে পারে। আমরা পূর্বে ঠিক করেছিলাম, যে বিষয়গুলির আলোচনা ইতিপূর্বে তেমন হয়নি, সেই বিষয়গুলিকেই মূলত গুরুত্ব দিতে হবে। সেই জন্যে এই গ্রন্থে এমন অনেক প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, যা পাঠককে নতুন চিন্তার খোরাক দিতে সাহায্য করবে। যেমন বিজন ভট্টাচার্যকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁর কাছ থেকে অভিনয়ের পাঠ নিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে অভিনয়কালীন মঞ্চ শেয়ার করেছেন—এমন একজন নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রী অসিত মুখোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধটির সন্নিবেশ এই গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে। সাতের দশকের প্রথমার্ধে বিজন ভট্টাচার্যের সান্নিধ্যে আসার মুহূর্তগুলিকে সাবলীল ভাষায় তিনি আমাদের জানিয়েছেন 'অন্তরঙ্গ বিজনদা' প্রবন্ধে। বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে সমাজতত্ত্ব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন একালের বহুখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রীকুন্তল মুখোপাধ্যায়। ইনি প্রান্তবাসী বেদেপল্লির মানুষদের জীবনধারণ ও তাদের জীবিকা নির্বাহের যেসব সমস্যা রয়েছে, তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন মুখ্যত 'গর্ভবতী জননী' নাটকটিকে অবলম্বন করে। তথাকথিত শিক্ষিত ও ভদ্র মানুষেরা যাঁদের ব্রাত্য, অন্ত্যজ, দলিত ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করেন, তাঁদেরকেও বিজন ভট্টাচার্য সভ্যতার পাদপ্রদীপের সম্মুখে এনেছেন অপরিসীম মমতায়—এই বিষয়টি

নিয়ে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক শুভঙ্কর রায়। বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে জাতীয়তাবাদ বিষয়ে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র বাইন। এছাড়া তাঁর রচিত 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন', 'দেবীগর্জন', 'জতুগৃহ' ইত্যাদি নাটকগুলি নিয়ে প্রথাসিদ্ধ এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে মৌলিক আলোচনা করেছেন বেশ কয়েকজন গুণীজন। রামকথার পুনর্ভাষ, মহিষাসুরমর্দিনী শক্তিদেবীর কথা, সামাজিক-রাজনৈতিক পালাবদলের ইঙ্গিত ইত্যাদি বিষয়গুলিও নানা প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হয়ে গ্রন্থটির গুরুত্ব বাড়িয়েছে। এছাড়া বিজন ভট্টাচার্যের নাটকগুলির প্রকাশ ও অভিনয়কালীন নানা তথ্যের বর্ণনা আমরা পাই তাপস সাহা এবং সুমিতা রায়ের প্রবন্ধ দুটিতে। সেই সঙ্গে সংগীত বিষয়ক আলোচনা, কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনাও গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে সংকলিত গ্রন্থটি গবেষক, নাট্যপ্রেমী ও বিজন ভক্তদের মনে বিজন ভট্টাচার্য সম্পর্কে বেশ কয়েকটি অনালোচিত দিককে বুঝতে সাহায্য করবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

মোট ২০টি প্রবন্ধ নিয়ে এই সংকলন গ্রন্থটি প্রস্তুত হয়েছে। সমস্ত প্রবন্ধকারকেই আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই আমাদের অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, উপাধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী একচিত্তানন্দ, প্রধান করণিক শ্রী রঞ্জন বিশ্বাসকে। একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই, আমাদের আলোচনাচক্রের সর্বস্তরের পৃষ্ঠপোষক, বিভাগীয় অধ্যাপকবৃন্দ, শিক্ষার্থী, গবেষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রাবাসকর্মী এবং বিদ্যামন্দিরের শিক্ষকবৃন্দকে। এঁদের সম্মিলিত সহযোগিতা ও কার্যকরী ভূমিকার কথা আমরা বর্তমান পরিসরে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। সবশেষে এই আশা—সংকলন গ্রন্থটি থেকে যদি কোনো পাঠকও উপকৃত হন, তাহলে সেটিই হবে আমাদের এই প্রচেষ্টার সার্থকতা।

নমস্কারান্তে—
বিভাগীয় অধ্যাপকবৃন্দ
বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

সূচি

অন্তরঙ্গ বিজনদা
অসিত মুখোপাধ্যায়
১১

বিজন ভট্টাচার্যের নাটকের সমাজতত্ত্ব : 'গর্ভবতী জননী' একটি নমুনা
কুন্তল মুখোপাধ্যায়
২১

'অ-ভদ্রলোক'-এর নাট্যজন বিজন
শুভঙ্কর রায়
৩১

বিজন ভট্টাচার্য ও বাংলা নাটক
সুমিতা রায়
৪৫

বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ
শ্রেয়া রায়
৫১

গোষ্ঠবাবুর নাটকের গান, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের শ্লোগান
অনুদাত্ত মল্লিক
৬১

চেনা নাট্যকার, অচেনা নাটক
তাপস সাহা
৭৫

'জবানবন্দী' : আকালের অন্ধকারে এক আলোর দিশা
সুবোধ মণ্ডল
৮৫

'দেবীগর্জন' : রামকথার পুনর্ভাষ্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
অরুণাভ মিত্র
৯০

'দেবীগর্জন' নাটকে লৌকিক উপাদান
তাপস পাল
১০২

বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবীগর্জন' : দিন-বদলের পালা
সত্যজিৎ দত্ত
১০৮
যে জন আছেন মাটির কাছাকাছি : প্রসঙ্গ 'আগুন'
অভিজিৎ পাল
১১৩
বিজন ভট্টাচার্যের সংগীত প্রজ্ঞা : 'দেবীগর্জন' নাটক
হৈমন্তী বড়ুয়া
১১৯
বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' : কৃষক আন্দোলনের অকৃত্রিম শিল্পরূপ
অনিরুদ্ধ নায়ক
১২৫
'দেবীগর্জন' : মিথের আলোকে
দীপায়ন পাল
১৩০
বিজন ভট্টাচার্যের নাটক : ভাববাদী দৃষ্টিতে
সুশান্ত মণ্ডল
১৩৩
বিজন ভট্টাচার্যের নাটক : সামাজিক রাজনৈতিক পালাবদলের এক অমূল্য দলিল
মালবিকা মণ্ডল
১৩৮
সম্পর্কের 'জতুগৃহ' : প্রসঙ্গ বিজন ভট্টাচার্য
বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য
১৪৯
ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং বিজন ভট্টাচার্যের নাটক
গোপাল চন্দ্র বাইন
১৫৪
ব্রাত্যের বিজন
দীপঙ্কর মল্লিক
১৭৫

অন্তরঙ্গা বিজনদা

অসিত মুখোপাধ্যায়

মহামতি ভগীরথ যেমন গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করে এক সজীব শস্য-শ্যামলা ধরিত্রী প্রদান করে আমাদের কৃতার্থ করেছিলেন, বাংলা তথা ভারতীয় নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই ভগীরথেরই মত শ্রী বিজন ভট্টাচার্য এক নাট্য-আন্দোলনের মাধ্যমে নাট্যজগতকে আলোড়িত ও আন্দোলিত করেছিলেন। সে দিক থেকে শ্রী ভট্টাচার্য বাংলা তথা ভারতীয় নাট্য-আন্দোলনের ভগীরথ হিসেবেই বিবেচিত হতে পারেন।

আধুনিক নাট্য-আন্দোলনের সূচনা-পর্ব থেকেই ব্যতিক্রমী নট ও নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের নাম গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গেই উচ্চারিত হয়।

জন্ম ১৭ জুলাই ১৯১৫, মতান্তরে ১৯১৭। সাক্ষাৎকারের সময় অন্যমনস্কতায় কোনো কোনো জায়গায় ১৯১৭ বলে ফেলায় সম্ভবত এই বিভ্রান্তি। বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার খানখানাপুরে জন্ম। বাবা ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য, মা সুবর্ণপ্রভা দেবী। চব্বিশ পরগনার আড়বেলে গ্রামে স্কুলজীবন শুরু হয়। ১৯৩২ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করে আশুতোষ ও রিপন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে পড়াশুনো সম্পন্ন হয়। খুব অল্পবয়স থেকেই বাবার কাছে নাটকের সূচনা বা হাতেখড়ি। বাড়িতে শেক্সপীয়র-এর অনুবাদ ছিল। সেটা ছোটো বয়সেই পড়ে ফেলেছিলেন। যখন দশ বছর বয়স, শেক্সপীয়র বোঝার কথা না, তখনই শেক্সপীয়র Recite করতে পারতেন। বাড়িতে বাবা শেক্সপীয়র পড়াতেন। মা পোরশিয়া, বাবা শাইলক, বাকিরা অন্য পার্টে। সরস্বতী পুজোর সময় গ্রামে থিয়েটার হতো। যাত্রা, কথকতা এবং ঢপেরও চলন ছিল। তিনি নিজেও কথকতা করেছেন।

বাবা ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। বাবার চাকরিসূত্রে খুলনা, যশোর, মেদিনীপুর, বসিরহাট, সাতক্ষীরায় থেকেছেন এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। ভীষণ ভালোবাসতেন ওদের সঙ্গে থাকতে, মিলতে এবং জানতে। সেই জন্য পূর্ববঙ্গ

ও পশ্চিমবঙ্গের Dialect ও Language গুলো তাঁর খুবই জানা ছিল। তাছাড়া গ্রামের এইসব প্রান্তিক মানুষগুলোর সঙ্গে গভীরভাবে মিশে তাদের সুখ-দুঃখ, অনুভূতি, আবেগের সঙ্গে এতটাই সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে পরবর্তী জীবনে তাঁর নাটকগুলোতে এঁদের খুব সততার সঙ্গে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি। পড়াশোনার জন্যে তাঁর কলকাতায় আগমন। এক সাক্ষাৎকারে বিজনদা জানাচ্ছেন—

> কলকাতা এসে বেলুড় মঠে যাতায়াত করতাম, Had a very sound health, লোকে আমাকে ভয় করতো। বিনয় (ঘোষ) Kept me company sometimes–Over night বসে থেকেছি অনেকবার। একেবারে Religion ছিল না, বলতে পারি না। I was restless with those questions। তার আগে আড়বেলের মঠেও কাজ করেছি, বাবার সেবক সমিতিতে উদ্যোগী ছিলাম। জনহিতকর কাজ ভালো লাগত। কলকাতাতে এসেও গ্রামের লোক আর সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশতাম। সেবা করতে পারতাম। সেবা করে অনেক রুগী বাঁচিয়েছি।

মার্কসবাদী রাজনীতির সঙ্গে যোগ তিনের দশকের শেষে। কলেজে এসে ছাত্র-ফেডারেশনের সদস্য হন। ছাত্র-ফেডারেশনের সভায় তখন এম. এন. রায়, সৌমেন ঠাকুর বক্তৃতা করতেন। ছাত্র-ফেডারেশনের কাজ করতে করতে Late thirties-এ ছাত্র জীবনের শেষ দিকে Marxism নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। ১৯৩৮-৩৯ নাগাদ আনন্দবাজার-এ কাজে যোগ দেন। ঐ সময় রেবতী বর্মণের মার্কসবাদ-বিষয়ক বই কিনে Review করেন। সেই Review পড়েই মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ তাঁকে খোঁজ করে ডেকে পাঠান। পার্টির সঙ্গে একটা যোগাযোগ হয়, তবে সম্পর্কটা পাকা হয় না। ১৯৩৯-এ তিনি টি.বি.-তে আক্রান্ত হন। যাদবপুর টি.বি. হাসপাতালে তাঁকে প্রায় বছরখানেক কাটাতে হয়। হাসাপাতালে অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে ইবসেন পড়ার ফাঁকে নাটক করার কথা তাঁর মাথায় আসে। পরিশেষে হাসপাতালে তাঁরই নাট্যরূপ, নির্দেশনা ও অভিনয়ে মঞ্চস্থ হয় 'চিকিৎসা সঙ্কট' ও 'বিরিঞ্চিবাবা'।

১৯৪০-৪১ নাগাদ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আকর্ষণের পরিণতিতে আনন্দবাজারের চাকরি ছেড়ে বিজন ভট্টাচার্য পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী মামা সত্যেন মজুমদারের 'অরণি' পত্রিকায় গল্প লেখা শুরু করেন।

১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ শুরু হয়। ওদিকে তখন বিশ্বজুড়ে সংকটাপন্ন অবস্থায় ইংরেজ সরকার। জাপানি সেনার কলকাতা আগমন ঠেকাতে বাংলার কৃষককুলকে অবর্ণনীয় দুর্দশার

সম্মুখে এনে দাঁড় করালো ইংরেজ সরকার। বাংলা জুড়ে নেমে এল বিধ্বংসী এবং কুখ্যাত সেই 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'। সরকারের তৈরি এই দুর্ভিক্ষে শত শত নিরন্ন মানুষ দু-মুঠো ভাতের আশায় গ্রাম ছেড়ে ভিড় জমাতে লাগল শহরে। ভাতের বদলে 'ফ্যান দাও', 'ফ্যান দাও' চিৎকারে কলকাতার আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হয়ে গেল। না খেতে পেয়ে হাজারে হাজারে মানুষ কলকাতার রাস্তায় পোকা-মাকড়ের মতো মরতে লাগল। বিয়াল্লিশের আন্দোলন ও তেতাল্লিশের মন্বন্তর অনেকের মতো সংবেদনশীল, দরদী ও মরমী বিজন ভট্টাচার্যের মনেও গভীর রেখাপাত করেছিল। নিরন্ন, ক্ষুধিতদের নিয়ে কিছু একটা করার তাড়না ও ভাবনা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। সেই চেষ্টাতেই প্রথমে 'আগুন', তারপর 'জবানবন্দী' এবং 'জবানবন্দী'র সাফল্যের পর 'নবান্ন'। কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা গণনাট্যসংঘের প্রযোজনায় 'নবান্ন' (১৯৪৪) মঞ্চস্থ হওয়ার পর 'নবান্ন' এবং 'গণনাট্য' প্রায় সমার্থক হয়ে উঠলো।

বাংলা তথা ভারতীয় নাট্য ইতিহাসের গতি পরিবর্তনকারী এই নাটক (নবান্ন) শুধু আপামর জনসাধারণকেই নয়, সমাজের বহু বিদগ্ধজনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। 'নবান্ন'-র নাটক-পাঠ শুনে সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য ছিল, 'ও তো জাত চাষা'। 'নবান্ন'-র অভিনয় দেখে উচ্ছ্বসিত নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর কৌতূহলী প্রশ্ন ছিল—'কোথায় শিখেছেন?' বিজন ভট্টাচার্যের সপ্রতিভ উত্তর—'রাস্তায় শিখেছি।'

১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে গান্ধিজির সঙ্গে কাজ করবার জন্য নোয়াখালি যেতে চেয়ে পার্টিকে আবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হন। এই প্রত্যাখ্যান মেনে নিতে না পেরে মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এবং প্রায় চার-পাঁচ মাস সব কিছু থেকে সরে থাকেন। তারপর এর থেকে মুক্তি পেতে ঐ বছরই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন প্রখ্যাত লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীর সাথে।

'নবান্ন'কে ঘিরে যে প্রবল উন্মাদনা জনমানসে আছড়ে পড়েছিল এবং গণনাট্য সংঘের মাধ্যমে যে আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল, কিছুকালের মধ্যেই তা স্তিমিত হতে থাকে। মূলত, রাজনৈতিক বামপন্থা ও সাংস্কৃতিক বামপন্থার বিরোধ-ই এর কারণ বলে মনে করা হয়; অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির কর্তাব্যক্তিদের শিল্পীর স্বাধীনতায় অনাবশ্যক হস্তক্ষেপের কারণে গণনাট্য সংঘে ফাটল ধরে। ১৯৪৮ সালে পার্টি বেআইনি ঘোষিত হওয়ার পরেই বেশ কিছু বিদগ্ধ মানুষ সংঘ ছেড়ে স্বাধীনভাবে তাঁদের শিল্প-সাধনায় ব্রতী হতে চান; এবং যথারীতি বেশ কিছু থিয়েটারের দল বা গ্রুপের পত্তন হয়। পরবর্তীতে শ্রী শম্ভু মিত্র প্রমুখরা একে 'নবনাট্য', 'সৎনাট্য' ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করেন। এ প্রসঙ্গে বিজনদার অভিমত—

সৎনাটকের মানেটা কী? গণনাটকের মানেটাই বা কী? গণের জন্য যে নাটক, সেটাই কি গণনাটক? সৎ-এর সে নাটক নয়? সৎনাটক গণনাটক হতে পারে না? নবনাটক কি সৎনাটক হতে পারে না? —না গণনাটকের নবনাটক হতে বাধা আছে? প্রলাপ, সংলাপ হলেও অপলাপ?

সংঘ ত্যাগ করে কিছুদিনের জন্য বিজনদা বোম্বাই (অধুনা মুম্বই) পাড়ি দিলেন। সেখানে হিন্দি ছবি 'নাগিন'-এর কাহিনি লিখলেন এবং চিত্রনাট্যে সহায়তা করলেন। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত সুপারহিট বাংলা ছায়াছবি 'সাড়ে চুয়াত্তর'-এর কাহিনিকারও শ্রী বিজন ভট্টাচার্য। সীমাহীন ব্যবসায়িক সাফল্য পেয়েছিল 'নাগিন' ছবিটি। ঐ ছবির সাফল্যের নিরিখে প্রখ্যাত অভিনেতা রাজ কাপুরের প্রযোজনা সংস্থা প্রভূত অর্থের বিনিময়ে বিজনদাকে চুক্তিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন বলে শোনা যায়। কিন্তু না, অর্থ, বৈভব, বিলাসের হাতছানি 'নবান্ন'-র স্রষ্টাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। এ ব্যাপারে পরবর্তীকালে বিজনদার কাছে আমরা জানতে চাইলে বিজনদা জানিয়েছিলেন—'হ্যাঁ, ঘটনাটা সত্যি'। অবাক বিস্ময়ে আমাদের জিজ্ঞাস্য ছিল—'এ রকম একটা চুক্তিতে সম্মত না হওয়ার কারণটা কি?' খানিক চুপ করে থেকে বিজনদার প্রত্যুত্তর ছিল এ রকম, 'আমার কলমের ফসলে এক ব্যবসায়ীর কোটি কোটি টাকা লাভ হবে অথচ তার কিয়দংশও আমার দেশের আপামর জনসাধারণের কল্যাণে ব্যয়িত হবে না, এটা আমি মেনে নিতে পারিনি এবং তাই চুক্তিবদ্ধও হতে পারিনি।' কথাটা শুনে শ্রদ্ধায় নতমস্তক হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। ঐ লোভনীয় প্রস্তাব হেলায় দূরে ঠেলে ফিরে এলেন কলকাতায়। ১৯৫০ নাগাদ তৈরি হল 'ক্যালকাটা থিয়েটার'। এই পর্বে তাঁর রচনা, নির্দেশনা ও অভিনয়ে বেশ কিছু ধ্রুপদী প্রযোজনায় সমৃদ্ধ হয় বাংলা থিয়েটার। প্রযোজনাগুলি হল যথাক্রমে—'দেবীগর্জন', 'মরাচাঁদ', 'ছায়াপথ', 'গোত্রান্তর', 'গর্ভবতী জননী' ইত্যাদি।

মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই তাঁর নাটকের মূল উপজীব্য। তিনি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে এ কথা বারবার বলতে বা বোঝাতে চেয়েছেন যে, 'মানুষের জন্য নাটক, নাটকের জন্য মানুষ নয়'। সংঘ ছেড়ে এলেও গণনাট্যের মূল প্রগতিবাদী ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরেই নাট্যচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। রাজনীতির মতো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও কমিউনিস্টদের সমভাবে অংশগ্রহণ থাকুক, এটাই ছিল তাঁর চিরকালীন অভিমত। ১৯৭৬ সালেও বিজনবাবু বলছেন—

তখন আমি পি.সি. যোশীকে বলতাম—I will soften the soil and you